২ এপ্রিল ২০১৮

দেশ

মৃত্যুহীন প্রাণ

পথিক গুহ • অভিজিৎ গুহ

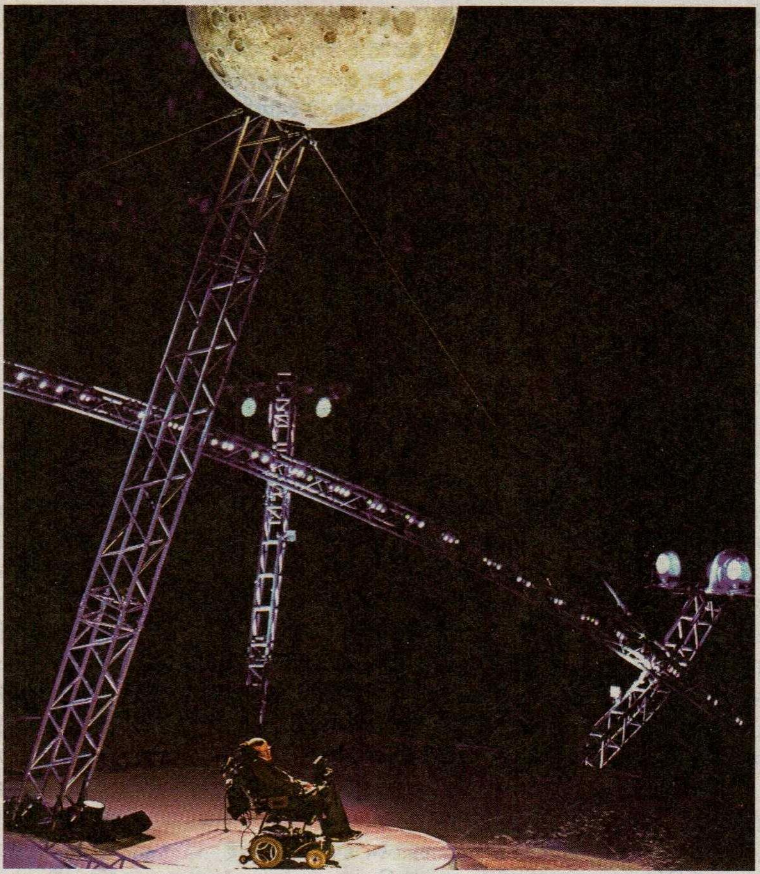

গেটি ইমেজেস

এক আশ্চর্য প্রেরণাময় জীবন

অ ভি জি ৎ গু হ

ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করেননি। একই সঙ্গে যাবতীয় শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকেও অস্বীকার করেছিলেন স্টিফেন হকিং।

কেমব্রিজের সিলভার স্ট্রিট, ওয়েস্ট রোড দিয়ে সন্ধ্যাবেলা একটি মোটর-চালিত হুইলচেয়ার চলেছে মন্থর অথচ দৃপ্ত গতিতে। একটি কর্মব্যস্ত দিনের শেষে ঘরে ফিরছেন এক গবেষক। কেমব্রিজবাসীদের চোখে এ দৃশ্য খুব বিরল ছিল না। ইংল্যান্ডের প্রতিটি ফুটপাথ হুইলচেয়ার ও অন্ধ ব্যক্তিদের চলার সুবিধের জন্য বিশেষভাবে নির্মিত। কিন্তু লক্ষণীয় হল, নিঃশঙ্ক এই হুইলচেয়ারটি চলেছে রাজপথ দিয়ে, ফুটপাথ দিয়ে নয়, হুইলচেয়ারের পিছনে দৃষ্টি-আকর্ষণকারী লাল আলোও নেই।

এই দৃশ্য দেখে আমি অনেকসময়েই 'যদি কিছু হয়'-এর অজানা ভয়ে শঙ্কিত হয়েছি, কিন্তু পরে বুঝতে পেরেছি, রাজপথ দিয়েই যাবে এই মহামানবের রথ। স্টিফেন হকিংকে দেখে দর্শক যখন ভাবছেন হুইলচেয়ারে বন্দি এক সঞ্চালনহীন দেহ, হুইলচেয়ারের মানুষটি তখন ভাবছেন, ভার্জিন গ্যালাকটিকের হাইপারসনিক স্পেস ট্যুরিজ়মের প্রথম টেস্ট ফ্লাইটের সওয়ারি হওয়ার জন্য তিনিই উপযুক্ত। সেই স্বপ্ন অংশত পূরণও হয়েছিল। ২০০৭ সালের ২৬ এপ্রিল সারা বিশ্ব স্তব্ধ হয়ে টেলিভিশনের পরদায় দেখল, আটলান্টিকের উপরে বিশেষভাবে প্রস্তুত ও সঞ্চালিত আকাশযানের গ্র্যাভিটিশূন্য পরিবেশে হকিং তাঁর হুইলচেয়ার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ধীরগতিতে একক মহিমায় ভাসছেন, মুখে যেন উদ্দীপ্ত হাসি।

হকিং-এর আত্মা কোনওদিনই হুইলচেয়ারে বন্দি ছিল না। তাঁর দেহে অ্যামিওট্রোপিক ল্যাটারাল স্ক্লেরোসিস (এএলএস) ছিল, কিন্তু তাঁর আত্মায় কোনও মোটর নিউরোন ডিজ়িজ় ছিল না। ওইদিন মহাকাশে তাঁর দেহও কিছু সময়ের জন্য স্বাধীনতা পেয়েছিল হুইলচেয়ার থেকে। স্টিফেন হকিংয়ের জীবন তাই আসলে এক উদ্‌যাপন, সেলিব্রেশন।

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রিনিটি কলেজে পিএইচ ডি শেষ করার

পর আমি ফেলো (Fellow) নির্বাচিত হলাম তারই পার্শ্ববর্তী গনভিল অ্যান্ড কিজ় (Gonville & Caius) কলেজে। স্টিফেন হকিং সেখানে প্রফেসরিয়াল ফেলো। এই সুবাদে চার বছরেরও বেশি সময় ধরে (১৯৯০-১৯৯৫) তাঁর সঙ্গে আমার নিয়মিত যোগাযোগ ও আলাপচারিতা। প্রথম যেদিন তিনি আমাকে চমকে দিয়েছিলেন সেদিনের কথা বলি। হাই টেবল-এ ডিনার, আমার উলটোদিকে স্টিফেন। কাঠের চেয়ারটিকে স্থানচ্যুত করে সেই পরিসরে বিরাজ করছে তাঁর হুইলচেয়ার। পাশে নার্স এলেন মেসন। স্টিফেনের বুকের ওপর একটা বিব বেঁধে দিয়ে তাঁর শরীরটিকে ধরে সূক্ষ্ম ভঙ্গিমা বদল করলেন। এলেন তাকালেন সামান্য প্রশ্নের ভঙ্গিতে, স্টিফেনের চোখে দেখলাম একটু ঔজ্জ্বল্য। ভাববিনিময় হল। বুঝলাম, তাঁর অবস্থানটি যে খাওয়ার পক্ষে ঠিকঠাক হয়েছে তার ইঙ্গিত দেওয়া হল।

নার্স খাইয়ে দিলেন স্টিফেনকে। হাই টেবল-এ তিন কোর্সের ডিনার। মূল পর্ব শেষ হলে পাশের আর-একটি ঘরে গিয়ে ডিনারের শেষপর্ব— চিজ়, ফল, ওয়াইন, কফি। এই পর্বে কয়েকজন ফেলোর সঙ্গে গল্প করছিলাম একটি দার্শনিক বিষয় নিয়ে: আমাদের ভাবপ্রকাশের জন্য ন্যূনতম কতগুলি শব্দ প্রয়োজন? কেউ বলছিলেন কয়েকশো, কেউ বললেন আরও বেশি, কেউ বললেন এর উপরে ভিন্ন জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির প্রভাব। হঠাৎ একটি যান্ত্রিক কণ্ঠ বলে উঠল, 'আমার কম্পিউটারের ডিকশনারিতে "..." হাজার "..." শ' "..."টি শব্দ আছে।' সঠিক সংখ্যাটি আজ আর মনে নেই, মনে আছে, স্টিফেন হকিং যে মন দিয়ে আড্ডা শোনেন এবং প্রয়োজনমতো তাতে অংশগ্রহণ করেন, এই বিস্ময়বোধ সেদিন শিহরিত করেছিল। আরও মুগ্ধ করেছিল তাঁর বক্তব্যের প্রিসিশন।

কিজ় কলেজের ইতিহাস খুব সমৃদ্ধ। অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ মিলিয়ে সর্বকালীন নোবেল প্রাপকের নিরিখে এই কলেজের স্থান ট্রিনিটি কলেজের পরেই। সুন্দর স্থাপত্য, ঘাসের লন ও উদ্যানের বৈশিষ্ট্যে কলেজটি অতুলনীয়। কলেজে তিনটি গেট বা তোরণদ্বার আছে। মূল প্রবেশদ্বারের নাম 'গেট অফ হিউমিলিটি', মধ্যের তোরণটির নাম 'গেট অফ ভারচু', আর সেনেট হাউসের দিকেরটি 'গেট অফ অনার'। নামকরণে মিশে আছে কী অনন্যসাধারণ দর্শন ও চিত্রকল্প! ছাত্রছাত্রীরা বিনয় নিয়ে কলেজে প্রবেশ করবে, কলেজে থাকাকালীন নানাবিধ গুণ অর্জন করবে, এবং শিক্ষান্তে সম্মানের তোরণ দিয়ে নির্গত হয়ে সেনেট হাউস থেকে ডিগ্রি লাভ করবে। কলেজে ফেলোরা বিশেষ সম্মানিত। ট্রিনিটি বা কিজ়-এর মতো ঐতিহ্যপূর্ণ কলেজগুলিতে ফেলোদের জন্য কিছু বিশেষ সম্মান ও অধিকার সংরক্ষিত আছে, যা বহির্জগতের কাছে হয়তো বিস্ময়কর লাগবে। যেমন, কলেজের অপূর্ব লনগুলির ধারে-ধারে নিষেধাজ্ঞা লাগানো আছে— 'প্লিজ কিপ অফ দ্য গ্রাস'। ছাত্রছাত্রী, কর্মী বা দর্শনার্থীদের ওই ঘাসের উপর বসা, দাঁড়ানো বা হাঁটা বারণ। এই বিশেষ অধিকার আছে কেবল কলেজের নিজের ফেলোদের। তেমনই ফেলোরা ডিনার করেন হাই টেবল-এ, যা বস্তুত অন্যদের খাওয়ার টেবলের চেয়ে খানিকটা উঁচুতে অবস্থিত। ফেলোরা খেতে আসেন গাউন পরে। ডিনারের নির্দিষ্ট সময়ের কিছুক্ষণ আগে ফেলোরা একটি ঘরে একত্রিত হয়ে, ঠিক সময়ে সারি দিয়ে আসল কক্ষে প্রবেশ করেন। একজন কলেজ-কর্মী ঢং করে একটি ঘণ্টা বাজিয়ে ফেলোদের প্রবেশের সময় সূচিত করেন। অন্য টেবলের সকলে উঠে দাঁড়ান, ফেলোরা নিজ-নিজ আসনে বসার আগে তাঁরা বসেন না। হাই টেবলটি লম্বাকৃতি, যার দুই ধারে সারি দিয়ে চেয়ার পাতা। দুই প্রান্তে একটি-একটি করে দু'টি মাত্র চেয়ার। এর একটিতে বসেন কলেজের 'মাস্টার', বা তিনি অনুপস্থিত থাকলে উপস্থিত ফেলোদের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠতম। এই চেয়ারে উপবিষ্ট ব্যক্তি ডিনারে নেতৃত্ব দেবেন, অর্থাৎ তিনি 'lead' করবেন, এই হল ট্রাডিশন।

একদিন এমন এক ডিনারের সময় অর্থনৈতিক ইতিহাসের শিক্ষক ইয়ান ম্যাকফারসন (Iain Macpherson) আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে স্টিফেন হকিংকে বললেন, "স্টিফেন, অভিজিৎ নাও স্টেজ় ইন দ্য হাউস ইন হুইচ ইউ ওয়ান্স স্টেড।" কিছুক্ষণ পরে যান্ত্রিক কণ্ঠে স্টিফেন উত্তর দিলেন, "স্টিফেন হকিং ইজ় স্টিল দি ওনার অফ দ্যাট হাউস।" ইয়ান হাসতে-হাসতে বললেন, "ইয়েস, ইয়েস, স্টিফেন, দ্যাট হাউস বিলংস টু ইউ।" রসবোধ, অধিকার-সচেতনতা এবং তথ্যের দিকটা নিখুঁত রাখার আগ্রহ— তাঁর সংক্ষিপ্ত সংলাপে এর সবক'টি ধরা পড়েছে।

যে-বাড়িটির কথা বলা হচ্ছে তার ঠিকানা ৬ লিটল সেন্ট মেরিজ় লেন। গ্র্যাজুয়েট সেন্টার-এর পিছনে অপ্রশস্ত এই রাস্তার ৬ নং বাড়ি, রাস্তার শেষে ছিল একটি গির্জা, বাড়ির উলটোদিকে কবরস্থান। প্রথমদিকে এই কারণে একটু যেন অস্বস্তি হত। ক্রমে বাড়িটির প্রতিটি অংশ যে এই বিরাট মানুষটির স্পর্শযুক্ত, এই বোধ প্রবল হল। ওই বাড়িতে থাকার ফলেই হয়তো স্টিফেন আমার সম্বন্ধে একটু বেশি আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। কয়েকবার জিজ্ঞেস করেছেন কেমন লাগছে তাঁর বাড়ি। মৃদু হেসে বলেছি, খুব ভাল। উনিও একদিকে ঠোঁটটি একটু পাশাপাশি প্রসারিত করে মৃদু হেসেছেন। ওঁর হাসিটা এত মিষ্টি ছিল!

শুধু বিজ্ঞানী বা আবিষ্কারকদের পরিমিত সীমানায় নয়, স্টিফেন হকিংয়ের প্রভাব বিশ্বজোড়া, সর্বব্যাপী। স্টিফেন হকিং দেশ-জাতি-ধর্ম-পেশা-লিঙ্গ-বয়স নির্বিশেষে সকল মানুষের জীবনকে উদ্ভাসিত করেছেন তাঁর বিজ্ঞান, চেতনা ও জীবনবোধ দিয়ে। তামাম জনমানসকে তিনি যেভাবে আকর্ষিত করেছেন, তাঁর তুল্য বিজ্ঞানীমহলে আর কেউ নেই। স্বভাবতই তাঁর বাড়িটিও সকলের আগ্রহ ও কৌতূহল উদ্রেক করত। একদিন সকাল দশটা নাগাদ তিনতলার স্টাডিতে বসে কাজ করছি, হঠাৎ মনে হল গ্রাউন্ড ফ্লোরে যেন বহু লোকের কণ্ঠস্বর একসঙ্গে শোনা যাচ্ছে। সিঁড়ি ভেঙে নীচে নেমে দেখি, আমার বসার ঘরে ঢুকে পড়েছেন বহু পুরুষ ও মহিলা— কেউ বসে, কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ হাঁটাহাঁটি করছেন। কারও হাতে মুভি ক্যামেরা। কেউ উজ্জ্বল আলো প্রক্ষেপণ করছেন। এত অচেনা লোক আমার ঘরে কেন? এর মধ্যে দেখি এক মহিলা সিঁড়ি দিয়ে খানিকটা উপরে উঠছেন, আবার বিশেষ কিছু একটা অনুধাবন করতে করতে ধীর পদক্ষেপে প্রতিটি ধাপ যেন মাপতে-মাপতে নীচে নেমে আসছেন। সিঁড়ি বেয়ে ওঠা বা নামাই যে আসল উদ্দেশ্য নয়, তা বোঝা যায়। তাঁকে বেশ কয়েকবার এরকম করতে দেখার পর আমি তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনারা কারা?" উনি পালটা আমায় জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কে?" অবাক হয়ে বললাম, "এটা আমার বাড়ি, এখানে আমি থাকি। এই তো আমি ঘুম থেকে উঠে ব্রেকফাস্ট সেরে তিনতলার স্টাডিতে বসে কাজ করছিলাম।" এতক্ষণে ব্রিটিশ ভদ্রমহিলাটি বুঝতে পেরে দুঃখপ্রকাশ করলেন এবং জানালেন যে, তাঁরা হকিং-এর উপর একটি শর্ট ফিল্ম নির্মাণ করতে চান, বাড়ির চাবি তাঁরা কলেজ থেকে সংগ্রহ করেছেন। সম্ভবত ফিল্মটির পরিচালক তিনিই। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি সিঁড়ি বেয়ে বারবার উঠে যাচ্ছেন আবার নামছেন কেন? ভদ্রমহিলা বললেন, তিনি কোথাও পড়েছেন স্টিফেন হকিং ওই সিঁড়ি বেয়ে কতদূর উঠতে পারেন, তা দিয়ে নির্ণয় করতেন ব্যাধির অগ্রগতি। মহিলাটি তাই নিজে ওঠানামা করে পঠিত প্রক্রিয়াটির একটি বাস্তব অনুভূতি অর্জনের চেষ্টা করছেন। ঐতিহাসিক সত্যাসত্য যা-ই হোক, প্যাশনটিকে তো অস্বীকার করা যায় না। বিজ্ঞান নিয়ে, বিজ্ঞানীর জীবন নিয়ে এমন প্যাশন আমাদের জীবদ্দশায় আর কোথায় দেখা গিয়েছে? ফেলো হিসেবে যোগ দেওয়ার পর প্রথম বছরটি আমি স্টিফেন হকিংয়ের বাড়িটিতে ছিলাম, তার পরের বছরগুলো আমার থাকার জায়গা হয় লর্ড রাদারফোর্ডের বাড়িতে। সে গল্প অন্যত্র।

স্টিফেন হকিং ছিলেন কেমব্রিজের লুকাসিয়ান অধ্যাপক। আমার সময়ে কলেজে হকিং ছাড়া আরও অনেক নামী ফেলো ছিলেন। যেমন ছিলেন নোবেলজয়ী নেভিল মট, জীবদ্দশাতেই যাঁর নামে ক্যাভেনডিশ ল্যাবরেটরিতে একটি বিল্ডিং ছিল (মট ছাড়া ক্যাভেনডিশের অন্য দু'টি বিল্ডিংয়ের নাম

রাদারফোর্ড ও ব্র্যাগ)। ছিলেন ক্যাভেনডিশ অধ্যাপক স্যাম এডওয়ার্ডস। ছিলেন নিম্ন-তাপমাত্রা পদার্থবিদ্যা বিষয়ে বিখ্যাত বিজ্ঞানী ডেভিড শোয়েনবার্গ, যিনি ভারতে কয়েকটি এমন ল্যাবরেটরি স্থাপনে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন। ছিলেন বিখ্যাত কেমিস্ট পিটার গ্রে (কলেজের মাস্টার)। কিজ্‌-এর অতীতও তেমনই গৌরবোজ্জ্বল। ফেলো ও অ্যালামনি মিলিয়ে অনেক বিখ্যাত নাম: উইলিয়াম হার্ভে, জেমস চ্যাডউইক, ম্যাক্স বর্ন, জন ভেন, জর্জ গ্রিন, হাওয়ার্ড ফ্লোরি, ফ্রানসিস ক্রিক, অ্যান্টনি হিউয়িশ, রোনাল্ড ফিশার, জন কনওয়ে। ইয়েন ম্যাকফারসন একদিন আমায় বললেন, "বিফোর ইউ, হোমি ভাবা অফ ইন্ডিয়া হ্যাড বিকাম আ ফেলো অফ দিস কলেজ।" নামের গুরুভারে তখন আমার স্কন্ধ অবনত।

একদিন হাই টেবল ডিনার শেষে অন্য ঘরে সেই চিজ্‌-ওয়াইন পর্ব চলছে, যার কথা আগে বলেছি। সেদিন স্টিফেন হকিং সিনিয়র-মোস্ট ফেলো। ফলে উনি টেবলের প্রান্তের চেয়ারে বসেছেন, 'লিড' করছেন। কিজ্‌ কলেজে তখন একটা প্রথা ছিল। এই পর্বে কেউ চাইলে ধূমপান করতে পারতেন, বাটলার একটা রুপোর পাত্র খুলে ধরতেন, তার মধ্যে থাকত বিশেষ সিগার। সেদিন স্টিফেন নির্দেশ দিলেন, "আই শ্যাল নট অ্যালাও স্মোকিং টুডে।" গুঞ্জন উঠল ট্র্যাডিশন লঙ্ঘিত হচ্ছে বলে। ধূমপায়ী দু'-একজন জনান্তিকে বিরূপ মন্তব্যও করলেন। কিন্তু স্টিফেন অবিচল রইলেন তাঁর সিদ্ধান্তে। তাঁর 'লিড' করার অধিকার, তিনি 'লিড' করবেন।

নিজের বক্তব্য অকপটে ব্যক্ত করার সাহসও তাঁর ছিল। লোকলজ্জা বা জনপ্রিয়তা হারানোর ভয়ে সংকুচিত হতেন না তিনি। কলেজের গভর্নিং বডির সভায় একবার কোনও একটি কারণে অর্থবরাদ্দ করা নিয়ে আলোচনা চলছিল। সিনিয়র 'বারসার' (Burser) অর্থের অপ্রতুলতার কথা তুলেছিলেন। স্টিফেন হঠাৎ বলে উঠলেন, কলেজ রিপোর্টের অমুক পাতায় দেখা যাচ্ছে কলেজ কয়েকশো হাজার পাউন্ড ব্যয় করে একটি বিল্ডিং ক্রয় করেছে, এমনকী তা করেছে কলেজের গভর্নিং বডিকে না জানিয়ে, আজ কেন তা হলে অর্থাভাবের দোহাই দেওয়া হচ্ছে? আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি বিজ্ঞান-গবেষকরা অনেক সময় প্রশাসনিক কাজ এড়িয়ে যেতে চান। আর স্টিফেন হকিং, প্রশাসনে জড়িত না থেকেও কলেজ রিপোর্টটি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পড়ে রেখেছেন!

প্রথমদিকে হাই টেবল-এ অনভিজ্ঞতাবশত একবার একটি প্রোটোকল বিপর্যয় ঘটিয়েছিলাম। সেদিন পার্শ্ববর্তী কক্ষ থেকে মূল ডাইনিং হলে প্রবেশের সময় আমাদের অবস্থানগত অনুক্রম অনুযায়ী হাই টেবল-এ আমার স্থান হল হকিংয়ের পাশে। একটি চেয়ার সরিয়ে স্টিফেনের হুইলচেয়ারটি সেখানে বসানো হল। ঠিক পাশের চেয়ারটিতে বসলে হয়তো স্টিফেনের অসুবিধা হতে পারে, একটি চেয়ার ফাঁকা থাকলে সেখানে প্রয়োজনমতো নার্স হয়তো বসতে পারেন, ইত্যাদি নানাবিধ ভেবে আমি স্টিফেনের ঠিক পাশের চেয়ারটি ছেড়ে তার পরের চেয়ারটির দখল নিলাম। ফলে বাকি ফেলোরাও একটি করে চেয়ার সরে বসলেন, আমাকে ডিঙিয়ে গিয়ে শূন্যস্থানটি পূরণ করা অন্যের পক্ষে অভব্যতা হত। আমাকে কেউ কিছু বলেননি, কিন্তু ডিনার শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই অন্য সিনিয়র ফেলোদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজে বুঝতে পারলাম শূন্যস্থানটি খুব অস্বস্তিকর হয়ে দাঁড়িয়েছে সকলের পক্ষে, অথচ প্রোটোকলে তখন কোনও রেক্টিফিকেশন বাটন নেই। ডিনার শেষ হলে সবাই হল থেকে নিষ্ক্রান্ত হলে আমি স্টিফেনের কাছে অ্যাপোলজি চাইলাম, আমার কাজের কারণ ব্যাখ্যাও করলাম। ওঁর চোখ ও মুখের ভঙ্গিমায় স্পষ্ট ছিল 'অ্যাপোলজি অ্যাকসেপ্টেড' এই বার্তা। কিন্তু নার্স তীক্ষ্ণভাবে বললেন, "ইট ওয়জ় আ বিট ফানি, দ্যাটস অল।" যাঁরা ব্রিটিশ ইংরেজির সূক্ষ্মতা ধরতে পারেন তাঁরা বুঝবেন আমাকে তিরস্কার করা হল।

কেমব্রিজে সারা বছর ধরে চলতে থাকে নানা সেমিনার ও পাবলিক লেকচার, সারা বিশ্বের দিকপালদের আবিষ্কার, বক্তব্য শুনতে পাওয়া যায়। শুনেছি স্টিফেন হকিংয়ের নানা পাবলিক লেকচার। প্রতিটিই উপস্থাপনায় অনবদ্য। একবার (১৯৯৪) নিউটন ইনস্টিটিউট-এ স্টিফেন হকিং ও রজার পেনরোজের পাবলিক ডিবেট ঘিরে সে কী উত্তেজনা! বিষয় 'দ্য নেচার অফ স্পেস অ্যান্ড টাইম'। আমি ও আমার এক গণিতবিদ বন্ধু ঘোষিত সময়ের ঘণ্টাখানেক আগে পৌঁছলাম মঞ্চের কাছাকাছি বসতে পারার জন্য। হকিং ও পেনরোজ় দু'জনেই গভীর চিন্তাশীল বক্তব্য রেখেছিলেন। দু'জনকে একই মঞ্চে দেখতে পাওয়াও তো একটা মূল্যবান স্মৃতি। 'রিয়ালিটি' বলতে কী বোঝায় সে সম্বন্ধে স্টিফেন বললেন, "These lectures have shown very clearly the difference between Roger and me. He is a Platonist and I'm a positivist. He's worried that Schrödinger's cat is in a quantum state, where it is half alive and half dead. He feels that can't correspond to reality. But that doesn't bother me. I don't demand that a theory corresponds to reality because I don't know what it is. Reality is not a quality you can test with litmus paper. All I'm concerned with is that the theory should predict the results of measurements."

> হাই টেবল ডিনার শেষে অন্য ঘরে সেই চিজ্‌-ওয়াইন পর্ব চলছে। সেদিন স্টিফেন হকিং সিনিয়র-মোস্ট ফেলো। ফলে উনি টেবলের প্রান্তের চেয়ারে বসেছেন, 'লিড' করছেন।

লেডি মিচেল হল-এ অনুষ্ঠিত অন্য একটি বক্তৃতায় তিনি দেখালেন যে, যদি সময়-কে একটি কমপ্লেক্স নাম্বার দিয়ে প্রকাশ করা যায়, যার রিয়াল ও ইমাজিনারি দুটো অংশ আছে, তবে স্পেস-টাইম-এর একটি সিঙ্গুলারিটি দূর হয়ে যায়। বক্তৃতার শেষে একজন প্রশ্ন করেন, কিন্তু সত্যিই কি সময় ইমাজিনারি? এর উত্তরে হকিং 'রিয়ালিটি' সম্বন্ধে উপরোক্ত বক্তব্যই প্রতিধ্বনিত করেছিলেন: "আ থিওরি ইজ় রিয়াল ইফ ইটস প্রেডিকশনস এগ্রি উইথ মেজারমেন্টস।" আর-একবার একটি বক্তৃতায় তিনি দেখালেন যে, বিগ ক্রাঞ্চ-এর সময় একটি রাশি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে। একজন শ্রোতা প্রশ্ন করলেন, "কিন্তু কয়েক বছর আগে আর-একটা বক্তৃতায় আপনি যে বলেছিলেন এই রাশিটার মান কমবে?" (ঘটনাক্রমে আমিও দুটো লেকচারেই উপস্থিত ছিলাম, এবং আমারও একই প্রশ্ন জেগেছিল, কিন্তু ভেবেছিলাম খাওয়ার টেবলে স্টিফেনকে জিজ্ঞেস করে নেব সকলকে ব্যস্ত না করে) কিছুক্ষণ পরে স্টিফেন সংক্ষিপ্ত ও নির্লিপ্ত উত্তর দিলেন, "আই হ্যাভ চেঞ্জড মাই মাইন্ড।" পাবলিক লেকচারগুলো সাধারণের কাছে আকর্ষণীয় করার জন্য গুরুগম্ভীর বিজ্ঞানের মাঝে তিনি গুঁজে দিতেন লঘু মুহূর্তও। যেমন, একবার ডিটারমিনিজম-এর উদাহরণ দিতে গিয়ে স্ক্রিনে প্রক্ষিপ্ত করলেন সামান্থা ফক্স-এর নিরাবরণ ছবি, যা 'দ্য সান' পত্রিকার পেজ থ্রি-তে প্রকাশিত হয়েছিল কিছুকাল আগে।

তাঁর মতে মহাবিশ্বের সমস্ত রহস্য বিজ্ঞানই একদিন উন্মোচিত করতে সমর্থ হবে, ভগবানের কোনও প্রয়োজনীয়তা নেই। তিনি থাকতে পারেন, কিন্তু বিজ্ঞানের সূত্রগুলি নির্বাচনে বা বাউন্ডারি কন্ডিশন নির্দিষ্ট করায় ঈশ্বরের কোনও ভূমিকা নেই। "What I have done is to show that it is possible for the way the universe began to be determined by the laws of science. In that case, it would not be necessary to appeal to God to decide how the universe began. This does not prove that there is no God, only that God is not necessary"। অস্তিত্বের নিরর্থকতাই ছড়িয়ে আছে হকিংয়ের লেখার বিভিন্ন পর্বে। তবে পাশাপাশি ভিন্ন একটি মতও আমি শুনেছি নিভৃত আলাপচারিতায়। কিজ্‌ কলেজের লাঞ্চে একদিন

একটি দেশের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল স্টিফেন ও আমার। ধর্ম কীভাবে বিভেদ ও সংঘর্ষের কারণ হয়েছে তার উপর আলোচনা। শেষে আমি বললাম, "অবশ্য আমার মনে হয় ধর্ম না থাকলে মানুষ হয়তো অন্য একটা কারণ তৈরি করে মারামারি করে মরত।" বাক্যগঠন করার জন্য সময় নিয়ে হকিং সমর্থন জানালেন, "আই অলসো থিংক সো। দে উড হ্যাভ ইনভেন্টেড সামথিং এলস টু কিল ইচ আদার।"

এই প্রবন্ধে হকিংয়ের জীবনপঞ্জি বা বৈজ্ঞানিক অবদান নিয়ে বিশেষ কিছু বলিনি, যেহেতু বহু লেখক ও ভাষ্যকার এ সম্বন্ধে অঢেল লিখেছেন। হকিংয়ের নিজের লেখাও সহজলভ্য। হকিং ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন তাঁর এপিটাফ-এ যেন লেখা থাকে শুধুমাত্র হকিং রেডিয়েশনের সূত্রটি: $S= \pi Akc^3/ 2hG$. বিজ্ঞানী লুডহ্বিগ বোলট্‌জম্যান-এর এপিটাফ-এর শীর্ষে লেখা আছে স্ট্যাটিস্টিকাল মেকানিকস-এর বিখ্যাত সূত্র: $S=k \log W$। ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক-এর সমাধিফলকটি সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত। উপরে শুধু লেখা তাঁর নাম (সাল-তারিখও লেখা নেই); আর একেবারে নীচে ছোট করে লেখা: $h=6.62\cdot 10^{-34}\ Ws^2$। যে-মহামানবদের বিশাল কর্মযজ্ঞের বর্ণনা হয় এত ছোট, বোঝা যায় তাঁরা কত বড় কাজ করেছেন।

ব্যক্তিগত স্মৃতি থেকে আর-একটি ঘটনা বলি। যে-সময়ের গল্প, তখন কিংস কলেজ ওয়েস্ট রোডে একটি ছাত্রাবাস তৈরির পরিকল্পনা করেছে। একটি বিখ্যাত স্থপতি সংস্থাকে নিয়োগ করা হয়েছে। তাঁরা নানারকম ডিজ়াইন করে আনেন; কলেজের গভর্নিং বডিতে তার চুলচেরা বিশ্লেষণ হয়— "এই বাড়িটার কোনও ক্যারেক্টার নেই," "এসথেটিকস-এ গন্ডগোল" ইত্যাদি। কয়েকজন ফেলো সুদীর্ঘ বাক্যবিন্যাস করে স্থপতিদের প্রতিটি ডিজ়াইনের সমস্যা ও খুঁত ধরায় পারদর্শী ছিলেন। স্থপতিরা ফিরে গিয়ে কিছুদিন বাদে আবার সংশোধিত ডিজ়াইন নিয়ে উপস্থিত হচ্ছিলেন। ফেলোরা আবার ফিরিয়ে দিতেন। এমনভাবেই চলছিল বহুকাল। স্টাডি করতেই জলের মতো পাউন্ড খরচ হতে লাগল। এমনই এক মিটিং চলছিল একদিন। হঠাৎ কম্পিউটারের যান্ত্রিক কণ্ঠে স্টিফেন বলে উঠলেন, "মাস্টার, মে আই স্পিক?" মাস্টার পিটার গ্রে (কেমিস্ট, রয়াল সোসাইটির ফেলো) অনুমতি দেওয়ার পর কয়েক মিনিটের নীরবতা। পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে জানি, স্টিফেন তখন গভীর অভিনিবেশ সহকারে কম্পিউটারের ডিকশনারি থেকে একটি-একটি করে শব্দচয়ন করে সযত্নে তৈরি করছেন তাঁর বক্তব্য। একটি মাত্র বাক্য। একটি বাক্য তৈরি করতেই যে দরকার অনেক অধ্যবসায় ও সময়। কিন্তু ওই একটি বাক্যই সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করবে হার্ট অফ দ্য ম্যাটার। স্টিফেন বললেন, "আই থিংক দেয়ার শুড বি হাফ অফ দ্যাট স্ট্রাকচার অ্যাট ওয়ান থার্ড কস্ট।" শুধু বক্তব্যের পরিমিতিবোধ নয়, দিলেন পরিমাণগত প্রিসিশন। এই মোদ্দা কথাটাই অত বাক্যবিন্যাস করে অনেকে অনেক মিটিং ধরে বলতে চাইছিলেন। আশপাশের বাড়ির তুলনায় প্রস্তাবিত বাড়িটি আকারে অসামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে বড় ছিল এবং প্রস্তাবিত মূল্য ন্যায্য দরের চেয়ে বেশি ছিল। এটাই অধ্যাপক হকিং অত নিখুঁত ভাবে প্রকাশ করলেন।

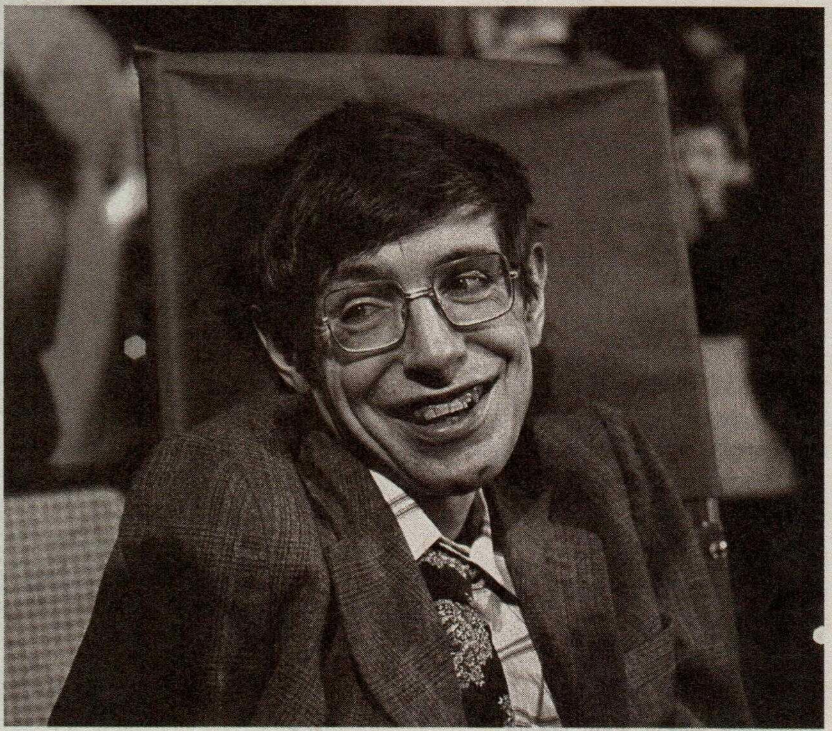

'আমি মৃত্যু-চেয়ে বড়ো'

আমি যে-সময়কার কাহিনি বলছি, সে সময় হকিং সামান্য অঙ্গুলি সঞ্চালন করতে পারতেন। পরবর্তীকালে তাঁর এই ক্ষমতা স্তব্ধ হয়ে যায়। তখন কম্পিউটারে কারসর-এর গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করতেন ও শব্দচয়ন করে বাক্যগঠন করতেন গালের একটি পেশির সাহায্যে। স্টিফেন নিজে লিখছেন, এই প্রক্রিয়া প্রয়োগ করেই, "My cheek movement is detected by an infrared switch that is mounted on my spectacles"। বাক্যগঠন সম্পূর্ণ হলে তা পাঠানো হত একটি স্পিচ সিনথেসাইজ়ার-এ, যেটি থেকে শ্রোতা শুনতে পেতেন স্টিফেন হকিংয়ের বক্তব্য। শরীর ক্রমশ যত অশক্ত হয়েছে, টেকনোলজির তত ক্রম-মানোন্নয়ন করতে হয়েছে প্রকৃতির সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার জন্য।

স্টিফেন হকিংয়ের জীবন প্রতিবন্ধকতাকে জয় করার প্রেরণা দেয়। বহুদিন ওঁর পাশে বসে দেখেছি, কীভাবে একটি-একটি শব্দ জড়ো করে একটি বাক্য তাঁকে তৈরি করতে হত। কখনও মনে হয়েছে হয়তো এই বাড়তি ঝামেলাই তাঁকে যে-কোনও ভাব সংক্ষেপে নির্ভুলভাবে প্রকাশ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। 'এ ব্রিফ হিস্ট্রি অফ টাইম'-এর প্রথম সংস্করণে স্টিফেন নিজে লিখেছিলেন, "In fact I can communicate better now than before I lost my voice"। ট্রাকিয়াস্টোমি অপারেশনের ফলে তাঁর কথা বলার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেল, আর এত বড় হারানো নিয়ে বিলাপ না করে তিনি বললেন এতে কী উপকার হল তার কথা। মোটর নিউরন রোগেও নাকি একটা সুবিধা হল। "My disabilities have not been a significant handicap in my field, which is theoretical physics. Indeed, they have helped me in a way by shielding me from lecturing and administrative work that I would otherwise have been involved in"। প্রতিবন্ধকতাকে সুযোগে রূপান্তরিত করার এ এক আশ্চর্য ও প্রেরণাময় কাহিনি।

স্টিফেন হকিং মৃত্যু সম্বন্ধেও রসিকতা করতে পেরেছেন: "I have lived with the prospect of an early death for the last 49 years. I'm not afraid of death, but I am in no hurry to die. I have so much I want to do first"। প্রতিবন্ধকতাকে উদ্দেশ্য করে হকিং যেন বলেছেন, 'আমি মৃত্যু-চেয়ে বড়ো'।

১৪ মার্চ, ২০১৮ স্টিফেন হকিং চলে গেলেন। পৃথিবীর জন্য রেখে গেলেন মহাকাশস্পর্শী জ্ঞান, জীবনদর্শন ও অনুপ্রেরণা।